প্রশান্তিকা

©

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রশান্তিকা

লাবিবা সালাত

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

প্রশান্তিকা
লাবিবা সালাত
গ্রন্থস্বত্ব©লেখিকা
প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৪৩১
জানুয়ারি, ২০২৫
রজব, ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

PROSHANTIKA
LABIBA SALAT
Copyright @ Labiba Salat
মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২
অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
বারোমাসি
মুদ্রাক্ষরিক : লেখিকা

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : দুইশত সত্তর টাকা মাত্র : US $3
ISBN: 978-984-99551-0-8

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :
www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গপত্রের কথা

শীত আসি আসি এক বিকেলে আহসান মঞ্জিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখেমুখে পড়লো অবাধ্য বৈকালিক রোদ। সেই মুহূর্তটাতে মনে হল, ১৮০ বছরের পুরোনো কোন নগরীর পথঘাটে সময়ের ফসিল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেখানে ফুটপাতের কার্নিশে অনাদরে ফুটে থাকে হলুদ বুনোফুল।

অগ্রাহায়নের প্রথম সূর্যাস্ত বিকালটাকে ফুরিয়ে দিলেও, ঋতুচক্রে তখনও হেমন্তের মেয়াদ ফুরোয়নি। চারদিকে সন্ধ্যার নাগরিক আলো। ১৮০ বছরের পুরোনো সেই নগরীর কল্পনার খোলস থেকে বেরিয়ে, ভাসানী স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়ালাম৷ ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে রিকশায় চেপে বসলাম। একটা মানুষ আমার মাথার তালুতে হাত রাখলো। মাথায় হাত বুলিয়ে কণ্ঠস্বরে কী যেনো মিশিয়ে বললো,

“বাবা! সাবধানে যেও।”

সেই সন্ধ্যায় মানুষটির ‘বাবা’ বলে করা আশ্চর্য এই সম্বোধনের অপেক্ষা আমৃত্যু পুষে রাখবো, তখনও ভাবিনি। অথচ, আশ্চর্য এই সম্বোধনের অক্লান্ত অপেক্ষা বয়ে বেড়াচ্ছি।

বইটি, আমাকে ‘বাবা’ বলে ডাকা মানুষটিকেই উৎসর্গ করলাম। উৎসর্গ পাতা জুড়ে মায়াসুতো দিয়ে স্মৃতি সেলাই করলাম। হৃদয়ের যাদুঘরে সেই স্মৃতি তুলে রাখলাম।

১

সাত দিন পর মোবাইলের ইন্টারনেট চালু করেছি। ধানের বস্তা উঠোনে ঢেলে দিলে যেভাবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, মেসেজ আর নোটিফিকেশনগুলো সেভাবেই মোবাইল স্ক্রিনে ছড়িয়ে পড়েছে। টুং-টাং শব্দের হিড়িক লেগে গেলো মোবাইলে। অনেক মেসেজ আর নোটিফিকেশনের ভীড় ঠেলে 'প্রাশান্তিকা রায়' নামটায় চোখের গাড়ি থামলো। প্রশান্তিকা দি'র মেসেজ আশা করিনি মোটেও।

"কীরে, কেমন আছিস?"

তিন দিন আগের মেসেজ। উত্তর করলাম, "কেমন আছি জেনেইতো নক করেছো।"

সাথে সাথেই উত্তর এলো, "হ্যাঁ! তোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এসেছি।"

"নাও! শুরু করো।"

"হা হা! হা! হা!"

"তোমার এই অট্টহাসি স্ক্রিন ভেদ করে কানে ঢুকে যাবে।"

"দেরি করো না। সান্ত্বনা নেবার জন্য আমি আমার হৃদয় খুলে বসে আছি।"

"শুরু করি তাহলে?"

"করো।"

"শুরু করছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে..."

"খুব মজা পাচ্ছো, তাই না?"

"আরেহ না না, মজা না। সিরিয়াসলি বলছি। জানি তো, তোর প্রেমিকা বিয়ে করে ফেলায় জীবন এখন দুর্বিষহ। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে তোকে ফিরে আসতে হবে। কাকা-কাকীমা'র স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। পরিবারের হাল ধরতে হবে। এভাবে শোক পালন করলে চলবে না।"

আরও কিছু লিখতে যাবে এমন সময় প্রাশান্তিকা দি'কে থামিয়ে বললাম, "তোমার সান্ত্বনা শুনতে ভালো লাগছে না, অন্য কিছু বলো।"

"আরে! সান্ত্বনা দিচ্ছি না। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা দিচ্ছি।"

"দিদি! এই পরিকল্পনা অন্য কোনদিন শুনি? আজ না হয় অন্য কিছু বল।"

"অন্য কী শুনবি? তাহলে ঠাকুমার ঝুলি খুলে তোকে শাকচুন্নির গল্প বলি।"

"থাক সেটা বলতে হবে না। যে আমায় ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে, ওই ছিলো আস্ত শাকচুন্নি।"

"কী মুশকিল! যাই বলি, তাতেই তোর ঘুরেফিরে একই কথা।"

"তুমি অন্য গল্প বলো।"

মেসেজটা আর সিন হচ্ছে না। অনেক বন্ধুরা আমায় মেসেজ করে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়, কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কারো মেসেজের প্রতি কোন অপেক্ষা নেই কিন্তু প্রশান্তিকা দি মেসেজ সিন করছে না দেখে কেমন জানি একটা অস্থির-অস্থির লাগছে!

প্রশান্তিকা দি' আমার কাকাতো বোন। কাকার চাকরিসূত্রে তারা ছোট থেকে সিলেটে থাকে। পূজা পার্বণেও তেমন একটা আসে না। বলতে গেলে মেজ কাকার সাথে আমাদের যোগাযোগের বেশ ভাটা পড়েছে। আমাদের আত্নীয়-পরিজনগুলো কেমন জানি খাপছাড়া। কারো সাথে তেমন আন্তরিকতা নেই, আবার সাপে নেউলে সম্পর্কও নেই। যে যার মতন। প্রশান্তিকা দি'কে শেষ দেখেছিলাম ৫ বছর আগে। এক পিষতুতো বোনের বিয়েতে, খুবই সাদামাটা থাকতে পছন্দ করে। এ যুগের মেয়ে হয়েও যেনো মনের মধ্যে পুষে রাখে আশির দশকের তরুণীদের মতন চিন্তাভাবনা। বয়সে আমার থেকে এক দেড় বছরের বড় হবে, আমি সবেমাত্র গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম। চাকরির পিছে ছুটতে গিয়ে দেখি, প্রেমিকা পয়সাওয়ালা বুড়ো বর জুটিয়ে আমাকে ফেলে চলে গেছে। এদিকে দিদি অলরেডি একটা স্কুলে পড়ায়। কুমারী তকমা গা থেকে এখনো খসে পড়েনি। ফেসবুকে খুব একটা ছবি দেয় না। তবে চশমা পরে এক্কেবারে মাস্টারনি লাগে। ছোটবেলায় একবার নাম ধরে ডেকেছিলাম বলে, দুরুম করে আমার পিঠে কিল মেরেছিলো। এরপর থেকে নাম শুনলেই পাঁচবার দিদি বলি!

যদিও দিদির সাথে দেখা খুব কম হয়েছে, সংখ্যাটা হাতে গুণে বলে দেওয়া যাবে এমন। দেখা যেমন কম হয়েছে, তেমনি কথাও। শেষ দেখা পাঁচ বছর আগে, শেষ কথা তিন বছর আগে। আমার প্রেমিকা, দিদির পূর্ব পরিচিত ছিল বলে ফেসবুকে তার বরের ছবির জায়গায় অন্য লোককে দেখে আমায় নক করেছে।

আচ্ছা, দিদি মেসেজ সিন করছে না কেন? ঘড়িতে রাত ১১ টা ৫৭ বাজে। এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল? আমি গান শুনছি, ফেসবুক স্ক্রল করছি আর তার মেসেজের জন্য অপেক্ষা করছি। আর এই অপেক্ষা গিয়ে ঠেকলো ভোরে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে গেলাম। উঠলাম বেশ বেলা করে। চোখ কচলে মোবাইল হাতে নিলাম। সচেতন ভঙ্গিতে চেক করা শুরু করলাম কোন মেসেজ এলো কি না। নাহ! এলো না। দিদি সেই যে গেল, যেমন করে আঁধারে হারিয়ে যায় মানুষ। হাতড়েও আর খুঁজে পাওয়া যায় না!

দুপুরের সূর্য নিস্তেজ

২

রোজ পুজো দেয়ার কাজে ফুল বাঞ্ছনীয় বলে মা বারান্দাতে অনেক রকম ফুলের গাছ লাগিয়েছে। একদিন আমি একটা বাগান বিলাসের গাছ পুঁতেছিলাম। সেই গাছে থোকা থোকা ফুল ধরেছে। ফুলগুলো গাঢ় মেজেন্টা রঙের। এই মেজেন্টা রঙ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি প্রশান্তিকা দি'র কাছে। একদিন ফুলের ছবি দিলাম। দিদি বলল, ''কী সুন্দর মেজেন্টা রঙের ফুল! জানিস, এই ফুলটা আমার খুব প্রিয়।'' আমি অবশ্য বেসিক কিছু রঙ ছাড়া অন্য রঙের নাম বলতে পারি না। এসব রঙের উপর পিএইচডি যেনো শুধু মেয়েরাই করেছে।

বিষণ্ণতা কেটেও যেনো আবার কোথাও ফেলে যাচ্ছে চিহ্ন। সেই চিহ্ন থেকে আবার তৈরি হচ্ছে বিষণ্ণতা। বুঝতে পারছি, আমি বিষণ্ণতার রোগী হয়ে যাচ্ছি। অকারণেই বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছি। রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। মা খেতে ডাকছিলো, কিন্তু খেতে ইচ্ছে না করায় মাকে জানালাম খাবার ফ্রিজে তুলে রাখতে।

মোবাইল হাতে নিয়েই দেখি দিদির মেসেজ।

''কীরে পুচকে, কী করিস?'' ইদানীং তার কাছে পুচকে ডাকটা শুনতে আমার আর ভালো লাগে না। যদিও যথেষ্ট স্নেহ আর মায়া নিয়ে ডাকে, তবুও ভালো লাগে না।

''পুচকে বোলো না। আমার ভালো লাগে না।''

''পুচকে পুচকে না বললে কী বলব?''

''আমি অতটাও ছোট নই।''

''তাহলে কি তুই খুব বড় হয়ে গেছিস?''

''হ্যাঁ! হয়েছি। পুচকে বলে স্নেহ প্রদর্শন করার চেয়ে অনেক বড়।''

''তবে কী বলে স্নেহ প্রদর্শন করব?''

''স্নেহ প্রদর্শন করতে বলেছি আমি?''

''কী আশ্চর্য! এভাবে রেগে যাচ্ছিস কেন?''

''সারাদিন কোথায় ছিলে? সারাদিনে আমার কথা তোমার একটুও মনে পড়েনি?''

''তোকে কি আমার সারাদিন মনে রাখার কথা?'' কথাটায় আমি খানিকটা আহত হলাম, মনের মধ্যে কোথাও ব্যথা লাগল। ক্ষণকাল চুপ থেকে লিখলাম, ''সারাদিন মনে রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ কেউ

৩

সকালে ঘুম ভাঙলো মা আর অনিমার চিৎকারে। উঠেই দেখি বাবা মেঝেতে ছটফট করছেন। এই দৃশ্য দেখে আমার মাথাটা যেনো মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গেল। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। অফিসে যাবার জন্য রেডি হয়ে বাবা আর বের হতে পারেনি। বুকের ব্যথায় মেঝেতেই শুয়ে পড়েছে। অনিমা চিৎকার করে বলল, "দাদা, অ্যাম্বুলেন্স ডাক! বাবাকে হাসপাতালে নিতে হবে।"

এবার যেনো আমার বোধ ফিরে এল। আমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। পরদিন বিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বাবার হার্টে ছোট একটা ব্লক ধরা পড়ল। ডাক্তার বলেছে এখনই অপারেশনের দরকার নেই। দুশ্চিন্তা কম করতে হবে, রেগুলার চেকাপে থাকতে হবে। এর সাথে আরও ব্লক ধরা পড়লে তারপর অপারেশনের চিন্তা করা যাবে। আপাতত বেশ কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করলো। বাবাকে রিলিজ দেবার পর বাসায় নিয়ে এলাম। শঙ্কামুক্ত হলেও শরীরটা বেশ দূর্বল, তাই কিছুদিন বাসায় বিশ্রাম করে তারপর অফিসে জয়েন করবে।

দুইটা দিন খুব ঝক্কির উপর গেল। ফোন হাতে ম্যাসেঞ্জার চেক করলাম। আমার চোখ প্রশান্তিকা রায়ের মেসেজ খুঁজছে। চোখের এই খোঁজা বৃথা যায়নি। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পর পর বেশ কিছু মেসেজ।

"কীরে পুচকে!"

"হারিয়ে গেলি নাকি?"

"এখনো শোকে আছিস?"

"বুঝলাম না, ছেলেটার হল কী?"

"কীরে! কই তুই?"

"কোন সমস্যা?"

মেসেজগুলো পড়ে ভালো লাগছে। এই যে আমায় নিয়ে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা, এটুকু দেখতে ভালো লাগছে। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।
আমি বেশ কয়েকবার মেসেজগুলো পড়লাম। তারপর টাইপ করলাম,
"আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা দেখছি। বাহ! ফিলিং স্পেশাল।"

সাথে সাথে রিপ্লাই এলো, "কই ছিলি তুই? আশ্চর্য! আমি আবার ভাবলাম, উল্টা পাল্টা কিছু করে বসেছিস কী না।"

"আরে নাহ! এক মাস হয়ে গেছে। ওসব করলে তো তিথির বিয়ের দিনই করতাম।"

"তাহলে? গায়েব হয়েছিলি কেন?"

"তোমার খুব চিন্তা হচ্ছিলো?"

"একটা সদ্য ছ্যাঁকা খাওয়া প্রেমিকের জন্য চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। যেকেউই চিন্তা করবে।"

"আমি নাই হয়ে গেলে তোমার খারাপ লাগবে?"

"ধুর! আমার কাজিনদের মধ্যে যেকেউ এমন করলেই খারাপ লাগবে।"

"ওহ!"

"কীসের ওহ?"

"না! কিছু না। ভাবলাম, আমার জন্য তোমার একটু আলাদাভাবে খারাপ লাগবে।"

"আলাদাভাবে খারাপ লাগা আবার কী?"

"কিছু না। আসলে, বাবার শরীরটা খারাপ ছিল। হাসপাতালে ভর্তি ছিল, ওখানে দৌঁড়ঝাপ করায় একটু গায়েব ছিলাম।"

"কী বলিস? কী হয়েছে? কাকা হাসপাতালে ছিল এটা আগে জানাবি না?"

"সময় পাইনি জানানোর।"

"কাকা এখন কেমন আছে? হাসপাতাল থেকে ছেড়েছে?"

"হ্যাঁ,

৪

বাইরে হাঁটছি। বিকালের রোদ নরম হয়ে এসেছে। ঢাকা শহরের রাস্তায় এত মানুষের ভীড়। ফুটপাত ধরে হাঁটতে গেলে তেমন কসরত করতে হয় না। পিছনের জন ঠেলে সামনে পাঠিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে এই মানুষের জঞ্জাল আর কোলাহল ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। অবশ্য এমনিতেই যেতে হবে। বাবার চাকরি শেষ হলেই চলে যাব গ্রামে। রাস্তায় এত কোলাহলে আর থাকতে ইচ্ছে হলো না। বাসায় ফেরার চিন্তা করলাম। সরকারি কোয়ার্টারের এই এক সুবিধা, চারপাশে অনেক বড় এরিয়া; গ্রামের মতই পরিবেশ। প্রতিটা কলোনিতে একটা করে বাচ্চাদের পার্ক আছে। চারপাশে গাছপালাও অনেক। কলোনিতে ঢুকে পার্কের বেঞ্চিতে বসলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে।

পাশের কলোনির শাকিল এসে কাঁধে হাত রাখল। এই কলোনিতে আসার পর থেকেই শাকিলের সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। শাকিলের বাবাও আমার বাবার সাথে চাকরি করে। তার সাথে আমার এত ভালো সম্পর্ক ছিল! যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন একবার ওরা ঈদ করতে গ্রামে যাবে; সেখানে আমাকে না নিয়ে যাবে না ও। আংকেল আন্টিও বলেছিলো যেতে কিন্তু কোরবানি ঈদ ছিল বলে বাবা যেতে দেয়নি। আমি ছাড়া পরিবারের সবাই পূজো-আর্চা, নিয়ম রীতি সবকিছুই নির্ভুলভাবে পালন করতো।

শাকিলের সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম। দু'জন বেকার এক সাথে বসলে মূলত হতাশার আলাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না। শাকিলের বাবারও শরীর বেশি ভালো না। সেও তার পরিবার নিয়ে চিন্তিত। হতাশার আলাপ শেষে যে যার বাসার দিকে চলে গেলাম। রাতের খাওয়া শেষে বিছানায় গিয়ে নেট অন করলাম।

প্রায় তিন সপ্তাহ পর দিদির মেসেজ।

"মন ভালো করে দে।" পড়ে বেশ অবাক হলাম।